

আমেরিকার বিশ্বায়ন পতনের মুখে

ইবরহিম বিন হাসান আল-আসিরি





“

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এসব বিবৃতি এবং এই সম্মেলনকে আমরা আমলে নিই না। আমরা যে বিষয়টিকে আমলে নিচ্ছি তা হল, তার এই আহ্বান নির্দেশ করছে আমেরিকার পলিসির বিস্তৃতি এবং এ সময়ের বাস্তবতাকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

আমেরিকার বিশ্বায়ন পতনের মুখে

ইবরহিম বিন হাসান আল-আসিরি

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা, প্রেসিডেন্ট হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে উদ্দেশ্য করে তার সর্বশেষ বিবৃতিটি দিয়েছে। বিবৃতিটি বেশ একতরফা ছিল। সে বিশ্বব্যাপি এক ঐক্যের ডাক দিয়েছে সমবেত বিশ্বায়নের দিকে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এসব বিবৃতি এবং তার দল ভারী করার ব্যাপারটি আমরা আমলে নিই না। আমরা যে বিষয়টিকে আমলে নিচ্ছি তা হল, তার এই আহ্বান নির্দেশ করছে আমেরিকার পলিসির বিস্তৃতি এবং এ সময়ের বাস্তবতাকে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

এ কথা অনেক বড় একটি মিথ্যার জন্ম দিচ্ছে যে, 'এটি শ্রেফ ওবামার পলিসি, অথবা অমুক অমুক ব্যাপারে ওবামার পদক্ষেপ'। ব্যাপারটি যেন এমন যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টই আমেরিকার এসব নীতির একমাত্র নির্ধারক। এটা আমেরিকার খুবই চতুর এবং প্রতারণামূলক দৃষ্টিভঙ্গি যা সে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে নিজের অতীত ভুল পদক্ষেপগুলোর দায়ভার বহন করার অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে নিজেকে কু-কৌশলে মুক্ত ঘোষণা করছে। আমেরিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

মূলত, এটি একটি ছলনাময় রাজনৈতিক চাল যা আমেরিকা বরাবরের মতোই তাদের কোন প্রেসিডেন্টের মেয়াদকালীন সময়ে হয়ে যাওয়া ভুলকে ঢাকতে ব্যবহার করে আসছে, যেন তাদের দ্বারা অতীতে কোন ভুল সংগঠিত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ, আফগানিস্তান এবং ইরাক তাদের জন্য যে পরিণতি বয়ে এনেছে, যেন এসবই প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের নীতির খেসারত! এবং বর্তমানে সিরিয়াতে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের হত্যাকাণ্ড হচ্ছে, তা যেন প্রেসিডেন্ট ওবামার নিরপেক্ষ নীতির কারণে, এবং এও বলা হচ্ছে যে, সেখানে যা হচ্ছে তা রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্র্যাটদের নীতির কারণেই হচ্ছে। দুঃখজনকভাবে এ সমস্ত প্রতারণামূলক বিবৃতি অনেক মুসলিম, এমনকি রাজনীতিবিদদের উপরেও প্রভাব ফেলেছে। অনেকে আশা ব্যক্ত করে বলে থাকেন যে, আমরা পরবর্তী প্রেসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করছি যিনি হয়তো বা তাদেরকে (সিরিয়ান) আশার আলো দেখাতে পারবে এবং তাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে।

সঠিকভাবে আমেরিকার পলিসিকে বুঝতে হলে, রিসার্চ সেন্টার, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে পাওয়া গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে বুঝতে হবে। তাই আমরা তাদের বিভিন্ন মিটিং এ নেয়া নীতি নির্ধারকদের সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে তাদের দেয়া ঘোষণা, বিবৃতিসমূহ এবং সিদ্ধান্তগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি। সন্দেহাতীতভাবে, আমেরিকার বৈদেশিক এবং আভ্যন্তরীণ নীতিসমূহ বারবার ঘুরে ফিরে এক জায়গাতেই যেয়ে ঠেকে। দলগুলো একই চাল বারবার চালে আর সে দলের প্রেসিডেন্ট তার ফলাফল নিষ্পন্ন করে থাকে। অতএব, প্রেসিডেন্ট এখানে শুধু কার্যনির্বাহির ভূমিকা পালন করে থাকে।

আমেরিকায় নীতি নির্ধারকদের পলিসি সর্বদাই তাদের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে বাহিরের অবস্থার একটা যোগসূত্র স্থাপন করে প্রণয়ন করা হয়। তাদের পলিসি হল বাহিরের সকল শক্তিকে বিবেচনায় রেখে আভ্যন্তরীণ শক্তির আদলে বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করা। উদাহরণস্বরূপ, যখন অর্থনৈতিক মন্দা বিরাজ করে তখন আপনি কখনোই একজন রিপাবলিকান অথবা ডেমোক্রটিক দলের প্রেসিডেন্টকে দেখবেন না যে তারা যুদ্ধে জড়ানো বা কোন দেশ দখল করেছে।

আমরা যদি উপরের উল্লেখিত আলোচনার উপর ভিত্তি করে আমেরিকার পলিসিকে বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে নিম্নে বর্ণিত আটকালের মূলভাব বুঝতে আমাদের জন্য সহজ হবে।

ওবামা তার বক্তৃতা শুরু করে, বৈশ্বিক একত্রিকরণ, পারস্পরিক সহযোগিতা, বিশ্বায়নকে আরো বেগবান করার বর্তমান পদ্ধতি এবং সাথে উল্লেখ করে যে, আন্তর্জাতিক রীতির এক-কেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট পরবর্তীতে মন্তব্য করে বসে যে, 'মায়ু যুদ্ধের সমাপ্তি অনেককেই দিনশেষে এই সত্যকে ভুলিয়ে দিবে, এ হল আমেরিকার কুটকৌশল, যা পরিষ্কার করে দেয় কিভাবে আমেরিকা বিশ্বায়নকে তাদের সাম্রাজ্যবাদ থেকে পৃথক রাখতে চায়। এ বিষয়টি বিশ্বাস করতে কষ্ট হতে পারে কারণ, এই বিশ্বায়নের আবির্ভাব হয়েছে সোভিয়েতের পতনের পর। এরপর বিশ্ব দেখেছে আমেরিকার যুদ্ধসমূহ, দখলদারিতা এবং আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের নেতিবাচক প্রভাব।

এরপর প্রেসিডেন্ট বিশ্বায়নে পুঁজিবাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। সে স্বীকার করেছে যে এই পুঁজিবাদি ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক ক্ষতির কারণ হয়েছে। তবে এটি তার আংশিক স্বীকারোক্তি, কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাস্তবতা হল এই ব্যবস্থা লোকেদেরকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে: এক শ্রেণী অটল সম্পদের মালিক হয়েছে, আরেক শ্রেণীকে করেছে রিজহস্ত, ঠেলে দিয়েছে দারিদ্রতার দিকে। বিশ্বায়নের প্রতি তাদের এই আহবান নির্দেশ করে যে, গুটি কয়েক রাষ্ট্র আরো ধনী হবে এবং অন্যান্য রাষ্ট্র এই বিশ্বায়নের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর ইতিপূর্বে এমনটাই হয়েছে অসম্পূর্ণ একীভূতকরণের ফলশ্রুতিতে।

বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক দিকটি ওবামার বক্তব্যে খুব বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি। এরপর সে কালচার হিসেবে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ এবং নীতিসমূহ এবং তার

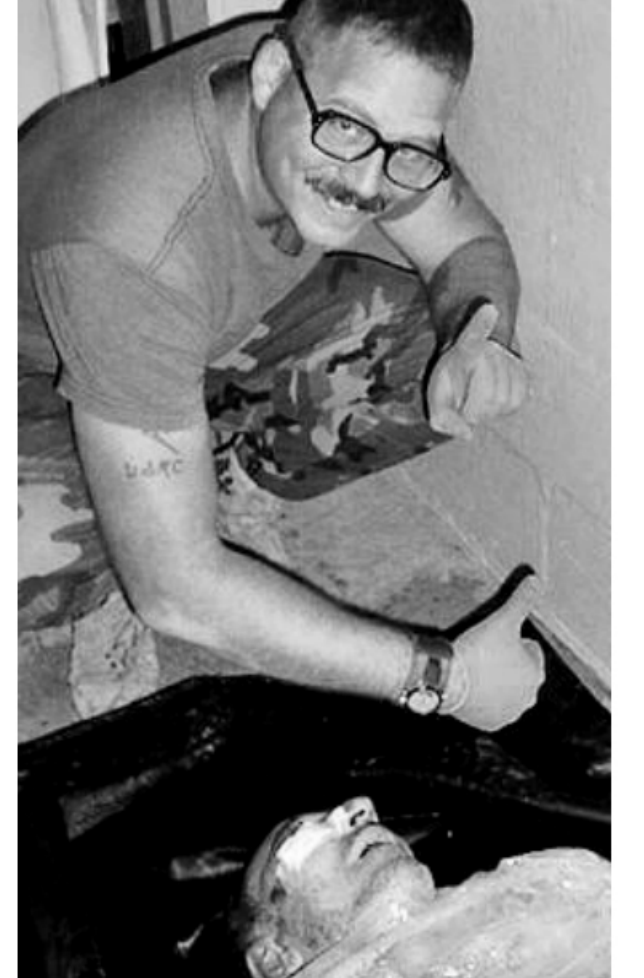
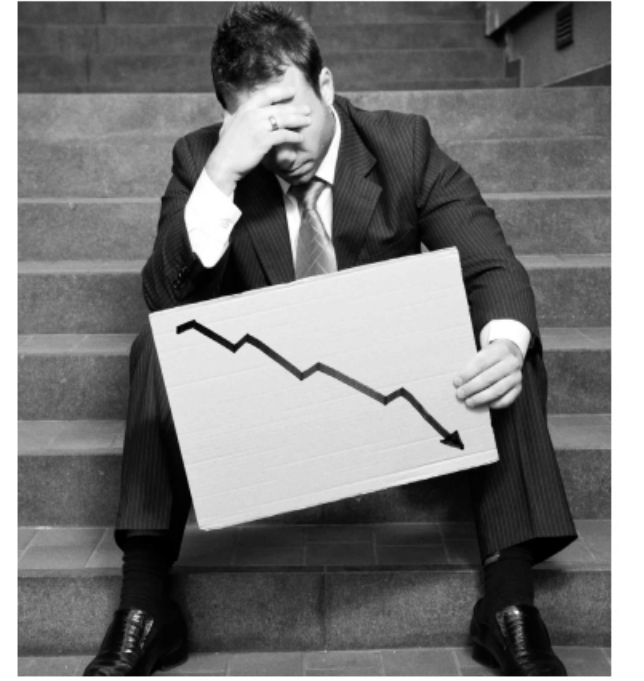
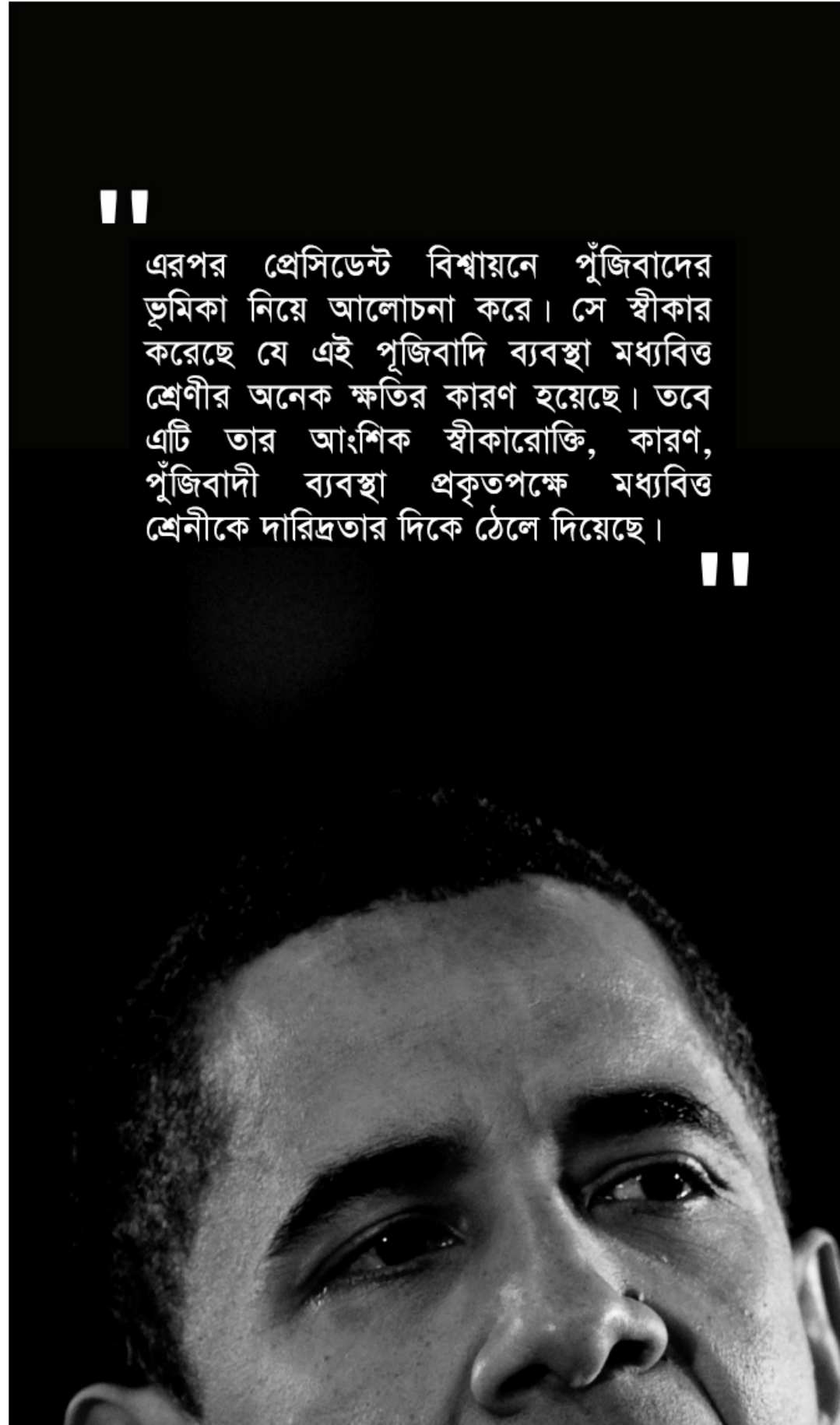
সংজ্ঞায়িত বিশ্বায়নের আদলে গঠিত রাষ্ট্রের কথা বলেছে। প্রেসিডেন্ট বেশি সময় ব্যয় করেছে গণতন্ত্রের প্রসংগ টেনে, একে ন্যায়পরায়ণতা এবং স্বাধীনতার স্বরূপ হিসেবে বর্ণনা করে। ন্যায়বিচার এবং সমঅধিকারের প্রসংগে সে বলে, 'বাস্তবতা এবং ইতিহাস দুটিকেই আমাদের পক্ষে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু আসলেই কি বাস্তবতা আর ইতিহাস আমেরিকার পক্ষে কথা বলবে এবং তাদের মিথ্যাচারের পক্ষ নিবে, অথবা বাস্তবতা যা যুবক মুসলিমদের কাছ থেকে কখনো লুকিয়ে রাখা যাবে?

আমেরিকার এই 'ন্যায়বিচার, উদ্ভাসিত হয়েছে যখন তারা ইরাক আক্রমণ করেছে, হত্যাজন্ত চালিয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে এবং তাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে। বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে ইরাকে আবু গারিব কারাগারে কি হয়েছে, কারাবন্দিদের সাথে আমেরিকার সৈন্যরা কেমন অমানুষিক আচরণ করেছে। আজ পর্যন্ত আমেরিকা ঐসব অপরাধীদেরকে শাস্তি দিতে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। বরং তাদেরকে পুরস্কৃত করেছে, সম্মানিত করেছে এবং যুদ্ধে তাদের ভূমিকার জন্য বীরের (!) উপাধিতে ভূষিত করে তাদের সাহসীকতার (!) জন্য মেডেল প্রদান করেছে। আফগানিস্তান এবং ইরাকে আমেরিকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীর কাছে অজানা নয়। আমেরিকা তাদের এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড স্বীকার করে কিন্তু একে প্রেসিডেন্ট বুশের আমলে হওয়া সন্ত্রাসী কাজের সাথে জড়িয়ে বিশ্বের সাথে প্রতারণা করে। এ হল আমেরিকার প্রতারণা এবং ধাক্কাবাজির একটি নমুনা মাত্র যা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। আর যদি প্রেসিডেন্ট ওবামার প্রশাসন, বুশের আমলের এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে দ্বিমত পোষণ করে, তাহলে কেন এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত অপরাধীদেরকে সামনে এনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের কাছে হস্তান্তর করছে না? এটি একটি যুক্তিসংস্কৃত প্রশ্ন যা আমেরিকার গণতন্ত্রের বাস্তবতা আর মূল্যবোধের সারসংক্ষেপ নির্দেশ করে।

”

এরপর প্রেসিডেন্ট বিশ্বায়নে পুঁজিবাদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে। সে স্বীকার করেছে যে এই পুঁজিবাদি ব্যবস্থা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক ক্ষতির কারণ হয়েছে। তবে এটি তার আংশিক স্বীকারোক্তি, কারণ, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে দারিদ্রতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

”



আমেরিকার গণতন্ত্রের বাস্তবতাকে উন্মোচন করে এমন আরেকটি ইস্যু হল ফিলিস্তিন। বিশ্বের কোন জাতির মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নেই যে, ফিলিস্তিনকে ইসরাইল দখল করেছে, ফিলিস্তিনের মানুষদেরকে অত্যাচার করেই চলছে। তাহলে এখানে আমেরিকার কেন অত্যাচারি রাষ্ট্রের উপর তাদের ন্যায়বিচারের মানদণ্ড আনছে না এবং ফিলিস্তিনীদের প্রতি ন্যায়বিচার করছে না? কিন্তু বিষয়টি আরো ন্যাক্কারজনক, কারণ আমেরিকার রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক সমর্থন ছাড়া ইসরাইল একটি রাষ্ট্র হিসেবে একা এত বছর ধরে এমন জুলুম নির্যাতন চালিয়ে যেতে পারত না। অতি সাম্প্রতিক সময়ে আমেরিকা তাদের ইতিহাসে ইসরাইলকে সামরিক ক্ষেত্র সম্প্রসারণে ৩৮ বিলিয়ন ডলারের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক অনুদানের অনুমোদন দিয়েছে। ওবামা প্রশাসন এই সহায়তার অনুমোদন দিয়েছে। আমেরিকা কোন ন্যায়বিচারের কথা বলছে? আপনাদের ঐতিহ্য এবং আদর্শ অনুযায়ী সন্ত্রাসীকে সমর্থন দেয়া কি সন্ত্রাস বলে বিবেচিত হয় না?

প্রেসিডেন্ট এরপর মধ্যপ্রাচ্য এবং সেখানের চলমান স্বৈরাচারি শাসনের প্রসঙ্গে কথা বলেছে। সে উল্লেখ করেছে, আমেরিকা যে গণতন্ত্রের দিকে আত্মান করে তা সেখানের সরকার ব্যবস্থার সাথে সাংঘর্ষিক। যেন সে বর্তমান মিশরের সরকারের দিকে রাগান্বিত হয়ে আছে! একজন খুব সহজেই প্রশ্ন করতে পারে যে, আরব বসন্তের আগে আরব স্বৈরাচারি শাসকদের কে সমর্থন দিয়েছিল? এবং কে তাদের সামরিক শক্তি

এবং সরকারকে চাপা করেছিল? সেটি কি আমেরিকা ছিল না? আর কে মিশরের সামরিক শাসক সিসিকে সমর্থন করেছিল, যেখানে এই সিসি একদিনেই ৪ হাজার আন্দোলনকারীদের হত্যা করেছিল? বাশার আসাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ এবং অর্ধেকের মত নাগরিকদের গৃহহারা অবস্থায় দেখেও কে না দেখার ভান করে ছিল? বাশারের এসব কর্মকাণ্ড কি যুদ্ধাপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে না? এসব বাস্তবচিত্র আমেরিকার গণতন্ত্রের কোন মূল্যবোধ না থাকার সাক্ষ্য দেয়। তাদের গণতন্ত্র শুধুই আমেরিকার স্বার্থ এবং তাদের জাতীয় নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছে।

এ ছাড়াও প্রেসিডেন্ট তার বক্তব্যে স্বাধীনতার প্রসঙ্গে বলে, 'আমি জানি কিছু দেশ উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিচ্ছে, কিন্তু তারা উন্মুক্ত সমাজ ব্যবস্থাকে প্রত্যাখান করেই যাচ্ছে, এই বক্তব্য প্রমাণ করে যে, তার এই বুলি নিতান্তই নিরর্থক যা কেবলমাত্র মিডিয়ার হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে, যেখানে তারা তাদের দেশে বসবাসরত আফ্রিকান আমেরিকানদের অধিকার দেয়া থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। আমেরিকা থেকে বেশি দূরে আমাদেরকে তাকাতে হবে না, ওবামা তার রাষ্ট্রের যে সুবিচারের কথা দস্ত ভরে প্রচার করে, সেখানে শতাব্দি ধরে একটি শ্রেণী তাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে একের পর এক আন্দোলন করেই যাচ্ছে। তারা হল আফ্রিকান-আমেরিকান যারা অনেকটা জোর খাটিয়েই তাদের অধিকার আদায় করেছে এবং তারা এখনো শ্রেণী বৈষম্যের

স্বীকার হচ্ছে। আমরা প্রায়ই ভিডিও, ডকুমেন্টরি দেখে থাকি জাতিগত দাঙ্গাকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডের উপর, যার বলি বরাবরের মতই আফ্রিকান - আমেরিকানদেরকেই হতে হচ্ছে।

ওবামা তার ভাষণে আরো বলেছে, 'মধ্যপ্রাচ্যের জন্য যা সত্যি, তা আমাদের সবার জন্যও সত্যি। আমরা ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সম্মান এবং সমুল্লত রেখেও যুবসমাজকে বিজ্ঞান এবং গণিতে দক্ষ করে তুলতে পারি,।... 'যদি আমাদের ধর্ম আমাদেরকে জাতি ও গোত্র ভেদে বৈষম্যমূলক আচরণের দিকে নিয়ে গিয়ে অন্য ধর্মের লোকদের প্রতি নির্যাতন, হয়রানি করায়... মেয়েদেরকে স্কুলে যেতে বাধা দেয়... আমরা এই ধরনের চিন্তা-ভাবনা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন যায়গায় দেখতে পাই....,

এই সংক্ষিপ্ত বাক্যগুলো তার দীর্ঘ ভাষণের সারাংশ, যার দ্বারা এ বিষয়ে সে তার নিজের অভিসন্ধি প্রকাশ করে। তার ভাষণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোকেদেরকে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছেঃ একদল আমেরিকার সংজ্ঞায়িত ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা এবং সমঅধিকারের প্রতিনিধিত্ব করেছে। অন্য দলটি স্বৈরাচারিতা, অবিচার, অধিকারের লংঘন এবং সভ্যতাগত দিক থেকে পিছিয়ে, অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্য এবং আরব দেশগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ওবামা এসব সমস্যার কারণ এবং তার উৎসকে ধর্মীয় মৌলবাদ, গোত্র এবং আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের দিকে আরোপ করে। এ



থেকে আমরা বুঝতে পারি যে 'সংস্কৃতির বিশ্বায়ন এবং একত্রিকরণ, শীর্ষক ওবামার সংক্ষিপ্ত ভাষণটি ছিল পুরোপুরি তার নিজের পছন্দ এবং ধারণার উপর।

কেউ যদি মনে করে এটি শ্রেফ ওবামার পলিসি, তাহলে সে ভুল করবে। বরং, এ হল মধ্যপ্রাচ্যের জন্য আমেরিকার নির্ধারিত পলিসি। আমেরিকার লক্ষ্য অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ চলমান থাকবে যতদিন না আমেরিকার বেঁধে দেয়া মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করা সরকারগুলোর পতন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সৌদি সরকার, যদিও তা হতে পারে ধীরে ধীরে। যুদ্ধসমূহ চলতে থাকবে যতদিন না তারা ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনগুলোর অস্তিত্ব বিনাশ করতে পারছে। আরব এবং মুসলিমরা ততদিন শান্তিতে থাকতে পারবে না যতদিন না তারা ধর্মের প্রতি তাদের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের বদলে আমেরিকার বানানো ধর্মের আদলে নিজেদের ধর্ম পালন করেছে। কারণ তাদের ধর্ম বিকৃত যৌনমিলনকে নিষিদ্ধ করে, যেখানে আমেরিকা এই বিকৃত কাজের দিকে মানুষদের আহবান করে। এ বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক যে, রাস্তায়

ওবামা ভাবছে
যে, এই
একত্রিকরণ
শুধুই
আমেরিকার
সংস্কৃতির গভির
মধ্যেই থাকবে
যেন আমরা
সবাই একসাথে
পশুদের মত
জীবনযাপন
করতে পারি
যার নেতৃত্ব
দেবে
আমেরিকা।

পশুদের মত নগ্ন হয়ে চলাফেরা করাকে আরব সমাজ নির্লজ্জতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই মূল্যায়ন করে থাকে। ওবামা ভাবছে যে, এই একত্রিকরণ শুধুই আমেরিকার সংস্কৃতির গভির মধ্যেই থাকবে যেন আমরা সবাই একসাথে পশুদের মত জীবনযাপন করতে পারি যার নেতৃত্ব দেবে আমেরিকা।

আমরা মানি, আমেরিকা বিগত দুই যুগ ধরে বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে এবং এখনো তাকে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবেই গণ্য করা হয়। আর পাশাপাশি আমেরিকাকেও স্বীকার করতে হবে যে, আমরা তার এই দস্ত অহংকারকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে সে অহংকারকে আমাদের বশে রেখেছি। আমেরিকা ক্রমশই বিশ্ব সামরিক বাহিনীর একচ্ছত্র নেতৃত্ব থেকে অপসারিত হচ্ছে কারণ, টানা ১৫ বছর ধরে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকাও স্বীকার করে নিয়েছে যে মুজাহিদ্দীনরা বিশ্বের কাছে তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছে, তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তিকে ধূলোর সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। আমেরিকা এখনো সে আঘাতের পরিনামে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে আর এই দুর্ভোগে তারা ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হতেই থাকবে যতদিন না আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের পতন হচ্ছে। যুদ্ধ অভিলাষ মাত্র আর ধৈর্যশীলরাই সুনিশ্চিত ভাবে বিজয়ী হবে আর এ যুদ্ধ তো এখনো শেষ হয় নি।

আমেরিকা পুরো বিশ্বকে শাসন করেছে, কিন্তু বিশ্ব এ শাসন থেকে আসলে কী পেল? এ বিশ্ব আমেরিকা



এমনটিই হল আমেরিকার চিন্তাভাবনা এবং তাদের নীতি। আর যাদের চিন্তা-ভাবনা এই ধরনের (যেমনটা আমেরিকানরা চিন্তা করে), বিশ্বকে তাদের নেতৃত্ব দেয়ার কোন অধিকার নেই।

নতুন করে কোন মূল্যবোধ এবং সুনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে? কিভাবে বিশ্ব আমেরিকার নীতি থেকে সুবিধা পেল, যখন আমেরিকা সর্বদাই নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে? কস্মিনকালেও আমেরিকা নিজেদের স্বার্থ ব্যতিত অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। হাজার হাজার মানুষ যখন মারা যায় আর বিশ্ব যখন তাদেরকে হস্তক্ষেপ করতে বলে তখন তারা জবাবে বলে, এখানে তাদের কোন স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা নেই।

আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট স্বার্থ যখন আসে তখন তারা হস্তক্ষেপ করে থাকে। এমনটিই হল আমেরিকার চিন্তাভাবনা এবং তাদের নীতি। আর যাদের চিন্তা-ভাবনা এই ধরনের (যেমনটা আমেরিকানরা চিন্তা করে), বিশ্বকে তাদের নেতৃত্ব দেয়ার কোন অধিকার নেই।

এমনকি পরিবেশও আমেরিকার পলিসি দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ইন্টারন্যাশনাল হেলথ অর্গানাইজেশন (WHO) এর সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশ্ব জনসংখ্যার শতকরা ৯২ ভাগ লোক দূষিত আবহাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও, ৬.৫ মিলিয়ন মানুষ বায়ু দূষণের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। এর অন্যতম কারণ হল আমেরিকার কলকারখানায় দ্বারা সৃষ্ট বায়ু দূষণ, যা বায়ুমন্ডলে মোট ৩৬.১ শতাংশ গ্রীনহাউস গ্যাস তৈরি করে থাকে। এতদসত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এসব গ্যাস উৎপাদন কমাতে আমেরিকা কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। উপরন্তু, গ্রীন হাউস গ্যাস তৈরিতে সহায়ক এমন পদার্থের ব্যবহার কমিয়ে আনার আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেছিল তারা। গ্রীনহাউস গ্যাসের ক্ষতিকর দিক গুলোকে সাহসিকতার সাথে দমনের কথা যখন ওবামার মুখ থেকে বের হয়, তখন তা শুনতে খুবই বিস্ময়কর এবং প্রতারণা মূলক মনে হয়, যেখানে তার নিজের রাষ্ট্রই এইসব মারাত্মক গ্যাসের নির্গমন প্রতিরোধ করতে কোন প্রকার কার্যকর পদক্ষেপ নেয় নি। শুনতে আরো বেশি হাস্যকর মনে হয় যখন ওবামা গ্রীন হাউস ফান্ড এবং টেকনোলজি সম্পর্কে বলে যে, 'দরিদ্র দেশগুলোর জন্য পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তিকে সহজলভ্য এবং সুলভ করে দিন,, যেন প্রযুক্তিকে পরিবেশ বান্ধব করে ব্যবহার করে এ দূষণ রোধ করা হয়! তার এ কথা শুনে মনে হবে, সে তৃতীয় বিশ্বকেই এ দূষিত গ্যাস উৎপন্ন করার দায়ভার দিচ্ছে।

ধর্মীয় মৌলবাদের সম্পর্কে তার কথা শুনে মনে হবে যেন সে প্রত্যক্ষভাবে ইসলামকে উদ্দেশ্য করেই প্রতিটি কথা বলছে। সে বলেছে, 'আমরা মধ্যপ্রাচ্যের অনেক জায়গায় এমন মানসিকতার উপস্থিতি দেখতে পাই,। আরব মুসলিম দেশগুলোকে উদ্দেশ্য করে বলে, 'আমরা ধর্মীয় ঐতিহ্যকে সম্মান এবং সমুন্নত রেখেও যুবসমাজকে বিজ্ঞান এবং গণিতে দক্ষ করে

তুলতে পারি,। এটি একটি ভিত্তিহীন পরামর্শ, এ কথার ফলে লোকদের কাছে বার্তা দেয়া হচ্ছে যে, সত্যিকার ধর্মের সাথে বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধি বিষয় যা ধর্মীয় বোধের আওতার বাইরে অথবা, এ ধর্ম বিজ্ঞানের আবিষ্কার গুলোকে এড়িয়ে যায় যা আমরা দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যবহার করে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি। মুসলিম গবেষক খোয়ারিজমির অবদান ছাড়া হয়ত আমরা আজকের আধুনিক কম্পিউটার দেখতে পারতাম না। মুসলিমরা যদি আন্দলুসে গবেষণাগার তৈরি না করতো, তাহলে হয়তো আমরা ১১৮ টি রাসায়নিক উপাদান দেখতেই পারতাম না। আধুনিক বিজ্ঞানের গাঁথুনি মুসলিমরাই স্থাপন করেছে। তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছে এবং বিশ্ব আজও সেই গবেষণালব্ধ তথ্যের ব্যবহার করে যাচ্ছে এবং এ থেকে সফল ভোগ করছে। এক সময় মুসলিমরা বিশ্ব শাসন করলেও, তারা কখনোই বিজ্ঞানকে নিজেদের ন্যাক্কারজনক কাজকে চরিতার্থ করতে ব্যবহার করেনি, কিংবা মানুষ হত্যা ব্যবহার করেনি। কারণ, ইসলাম নিজস্ব আইন এবং সুনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে, যা এর অনুসারীদেরকে এই পৃথিবীর উন্নয়নের এবং মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার কায়মের নির্দেশ দেয়। এই নীতিকে পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে আমেরিকা লংঘন করে। বাস্তব বিজ্ঞান এই বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক। আর তাই তাদের চাচগুলো বিজ্ঞানের সাথে একমত হতে পারে নি, এর ফলে অতীতে তারা অনেক বিজ্ঞানীদেরকে হত্যা করেছিল। তাই তাদের বিকৃত ধর্ম এবং বাস্তব বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী এক সমাধান হিসেবে ধর্ম নিরপেক্ষবাদকে উসকে দিয়েছে। সেই সময়ে ব্যবহারিক বিজ্ঞান সকল নৈতিকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বিজ্ঞান ব্যবহৃত হয়েছিল উপযোগবাদ এবং ক্ষমতা দখলে। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা সিভিল সাইন্স এবং ধর্মের মধ্যকার সমন্বয় সাধন করেছে এবং এসবের সাথে সংগতি পূর্ণ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়াদির প্রমাণ সেই ১৪০০ বছর আগেই কুরআনে ইশারা করা আছে বলে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহই এই মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা এবং তার দ্বীনই একমাত্র সঠিক ধর্ম যার নাম ইসলাম, যে ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দেয় বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে পৃথিবীর জন্য কিভাবে গঠনমূলক কাজ করা যায় এবং মানুষের কল্যাণে কাজে লাগানো যায়, ইসলাম আমাদেরকে পারমানবিক অস্ত্র এবং ক্ষতিকর গ্যাস ব্যবহার করে পৃথিবী ধ্বংসের শিক্ষা দেয় না।

এতএব, সত্যিকারের ধর্ম ইসলাম ছাড়া অন্য কোন তত্ত্ব-মন্ত্র মানবতার কল্যাণে ফলপ্রসূ হবে না আর এর স্বাক্ষ্য আমরা ইতিহাস এবং বাস্তবতা থেকেও পাই। ইসলামই একমাত্র এক দ্বীন যা মানবতার কাজে উত্তম এবং পরিপূর্ণ একটি মডেল স্থাপন করতে পারে, যা কিনা অন্য কোন মানব রচিত বিধান অথবা মূল্যবোধ থেকে আমরা পাব না।

আমরা সকলেই অবগত আছি যে সত্যিকার ইসলাম এসেছে

পুরো বিশ্বের মানুষের উপর ইনসাফের শাসন কায়ম করতে। মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল আমেরিকার সৃষ্ট সকল শয়তানি কার্যক্রম বিনাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যা ইসলামের এই আগমনকে আরো বেগবান করবে। আমাদের এই দ্বীন ইসলামকে এর যোগ্য জায়গায় অধিষ্ঠিত করে ন্যায় এবং ইনসাফ প্রতিষ্ঠা এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। আমাদের দ্বীন নির্দেশ দেয় বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মন্দকে প্রতিহত করতে। একে আলেমরা বলে থাকেন, বিজ্ঞানের শক্তি। বিজ্ঞানের শক্তিকে ব্যবহার করেই আমাদের বীরেরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেট্রাগনে হামলা চালিয়েছিল। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেই আমরা তোমাদের এয়ারপোর্ট এবং তোমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিতে পেরেছি। তোমাদের আরো শোকার্ত অবস্থা দেখতে আমরা আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো। হে আমেরিকা, জেনে রাখো, বিজ্ঞান কেবলমাত্র একটি পন্থা, কিন্তু আমরা সর্বদাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর উপর ভরসা করি।

যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ সম্মেলনে দেয়া ওবামার ভাষণকে যারা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তারা বুঝতে পারবেন যুদ্ধ থেকে পাওয়া তার অবসাদ আর ধানি, পরাজয় মেনে নেয়ার আভাস এবং নিজেকে সবার সামনে ছোট করে অন্য সকল জাতিদেরকে একত্রিত হয়ে তাকে সঙ্গ দেয়ার এই হৃদয়বিদারক আহ্বানের কারণ। আপনি তার কথায় আগের সেই গর্ব আর অহংকারকে খুঁজে পাবেন না। বিশ্বের একমাত্র পরাজিত হিসেবে নিজেকে জাহির করার প্রবণতা ম্লান হয়ে গিয়েছে আর তাই আমেরিকা অন্য জাতিসমূহকে বলছে তারা সবাই মিলে একক শক্তি। আমেরিকার বিরুদ্ধে ঐর্ষ্যের সাথে জিহাদ করে যাওয়াই তাদেরকে এমন বশীভূত অবস্থায় উপনীত করেছে। হয়তো বা আরো কিছু সময় অতিবাহিত হলে আমেরিকার ঐ প্রতিপত্তিকেও ভুলে যাওয়া হবে ইনশা আল্লাহ।

আমরা ইনশা আল্লাহ সামনে, তাদের এই বিশ্বাসনের সিস্টেমকে ধ্বংস করে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে পরিচালিত ইসলামের সিস্টেম দিয়ে প্রতিস্থাপন করার প্রয়োগিক ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাবান, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরাই তা জানে না।

